ক্রিসমাসের গল্প

ডিসেম্বর মাস ক্রিসমাসের উৎসব নিয়ে আসে। মাস শব্দটি বাংলা ও ইংরেজিতে ভিন্ন অর্থ বহন করলেও উৎসবের কল্যাণে তা সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। সনাতন ধর্মের ভক্তিসাধকের কাছে যিশুর জীবন ও উপদেশ খুব সহজেই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারে এবং ওঠেও। অদ্বৈতবাদের উদার দৃষ্টিতে খ্রিস্টের শৈলোপদেশ ব্যাখ্যা খুব আকর্ষণীয় হয়। এটি খেয়াল করেই স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের শিষ্য স্বামী প্রভবানন্দজী—যিনি আমেরিকায় বেদান্তপ্রচারে নিযুক্ত ছিলেন—ধারাবাহিকভাবে শৈলোপদেশের সাপ্তাহিক

অজয় কুমার ভট্টাচার্য

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের স্বনামধন্য লেখক

ব্যাখ্যা শুরু করেন। সেগুলি 'SERMON ON THE MOUNT–ACCORDING TO VEDANTA' নামে বই আকারে প্রকাশিত হয়। তিনি নিজেই এ-সম্বন্ধে বলেছেন, ''আমি খ্রিস্টান নই বা ধর্মতত্ত্ববিদও নই; আমি খ্রিস্টান পণ্ডিতদের রচিত বাইবেলের বিভিন্ন ব্যাখ্যাও পড়িনি। আমি যেমনভাবে বেদান্তাদি শাস্ত্রগ্রন্থ পড়েছি তেমনিভাবে 'নিউ টেস্টামেন্ট' পড়েছি।'' বেদান্তের বাণীর সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখে তিনি বেদান্তের দৃষ্টিতে শৈলোপদেশের ব্যাখ্যা করেন। বইটি যে খুব সমাদৃত হয় তার কারণ—ব্যাখ্যা যুক্তিসমৃদ্ধ, বিশ্বাসনির্ভর নয়।

সেযুগে রোমান সম্রাটই একমাত্র ভগবান বা ভগবানের দূত এবং প্রাদেশিক শাসকেরা তাঁর অনুচর। সাধক 'জন' জগতের অতীত ঈশ্বরের উপস্থিতিতে বিশ্বাস নিয়ে জর্ডন নদীর তীরে প্রথম মানুষকে দীক্ষা (ব্যাপ্টাইজেশন) দিতে শুরু করেন। জন্মাবধি ঈশ্বর-অনুরাগী যিশু জনের কাছে দীক্ষা নিতে গেলে তিনি নাকি তাঁকে বলেন, ''আমি তোমাকে দীক্ষা দেওয়ার যোগ্য নই তবু দেব, কারণ এ-পথের অঙ্গীকার নিয়ে চলতে এর দরকার আছে।'' এরপরেই যিশু চল্লিশ দিনের জন্য নির্জন পাহাড়ে সাধনায় বসেন। বলা হয়, পাহাড়ে ওঠার

পথে এক নির্জনবাসী মানুষ তাঁকে ওই পাহাড়ে ওঠা থেকে বিরত করতে নানা প্রলোভন দেখায়। কিন্তু যিশু প্রতিটি প্রলোভনকে জয় করেন। পাহাড়টিকে যদি সমাধির উচ্চস্থান বলে ধরি তাহলে বুদ্ধের বোধিলাভের পথে 'মার' বা শ্রীরামকৃষ্ণের সামনে থালাভরা সন্দেশ, নথ পরিহিতা সুন্দরী, টাকার তোড়া ও শালের প্রলোভনের খুব একটা তফাত খুঁজে পাওয়া যায় না। সেখান থেকে ফিরে যিশু চতুর্দিকে প্রচার করতে থাকেন এবং বহু মানুষ তাঁর অনুগমন করে। নির্বাচিত কয়েকজনকে নিয়ে তিনি ওই পাহাড়টিতে উঠে তাদের বিশেষ উপদেশ দেন যেটি শৈলোপদেশ নামে বাইবেলে পাওয়া যায়। এটির যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা না করতে পেরে এটিকে বাইবেলে প্রক্ষিপ্ত বলে অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন। এই উপদেশের মধ্যে কয়েকটির ব্যাখ্যা আমরা দেখব।

''বিনম্র আত্মারাই ধন্য কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই মধ্যে।''

গীতায় দৈবীসম্পদের কথা আছে, তার মধ্যে দীনতা একটি সম্পদ। অধ্যাত্মজীবনের প্রথম পদক্ষেপ হল দীনতা। একজন দক্ষিণ ভারত থেকে মঠে এসেছেন যোগ দিতে। রাজা মহারাজ জিজ্ঞাসা করছেন, ''কতদূর পড়েছ?'' তিনি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট তাই বললেন, ''পড়াশুনো সব শেষ করেই এসেছি।'' শুনে মহারাজ বললেন, ''তাহলে আর কী করতে এসেছ?'' উচ্চশিক্ষার প্রচ্ছন্ন অভিমানকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। জানার অভিমান নতুন কিছু জানতে দেয় না, যা অধ্যাত্মপথের বড় বাধা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, অনেক জানার নাম অজ্ঞান, এক জানার নাম জ্ঞান। আমাদের অনেক জানার অহংকার 'অনেক'-এর উৎস এককে জানতে দেয় না। সেই 'এক'-কে আমরা জানি না বা জানতে পারি না, এটি বুঝলে তবে আমাদের অনেক জ্ঞানের তুচ্ছতা বোধে আসে। তখনই মানুষের দীনতা আসে। কিন্তু দীনতা অনেক বিবেক-বিচারের ফল, তাই সকলের তা আসে না। এইজন্য যিশু বলছেন, যারা বিনম্র তারা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের পথ তাদের জন্যই খোলা। আমাদের অধ্যাত্মরাজ্যই যিশুর স্বর্গরাজ্য, যেখানে কেবল ঈশ্বরতত্ত্বকে নিয়ে থাকা। গীতায় ভগবান বলছেন, ''তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।/ উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্ব-দর্শিনঃ॥''—যাঁরা জ্ঞানী তাঁদেরকে প্রণিপাত ও যথার্থ জিজ্ঞাসু হয়ে সেবা করলে তাঁরা আমাদের যোগ্যতা বিচার করে সেই জ্ঞান আমাদের উপদেশ করবেন। দীনতা আনার উপায় সাধুসঙ্গ।

''ধর্মের জন্য যারা ক্ষুধার্ত ও তৃষিত তারা ধন্য কারণ তাদের হৃদয় পূর্ণ হবে।''

ধর্ম বলতে অধ্যাত্মজীবন বা ঈশ্বরলাভের আকাঙ্ক্ষা। এর জন্য যারা ক্ষুধার্ত বা পিপাসিত তারা ধন্য কারণ তারাই ঈশ্বরীয় আনন্দের অধিকারী হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ একে বলছেন ব্যাকুলতা, ভগবানকে লাভ করবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু এটি দুর্লভ, তাই তিনি আরও বলছেন, ''ব্যাকুলতা এলেই অরুণোদয় হল, এর পরেই সূর্য দেখা দিবেন।'' কিন্তু এই ব্যাকুলতা, ধর্মের জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষিত হওয়া কি সহজ কথা! আমাদের মন সর্বদাই ভোগের জন্য ব্যাকুল, তাই ঈশ্বরে মন হয় না। আসলে আমরা স্বরূপত ঈশ্বর হয়েও তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করি, তাই আমাদের অপূর্ণতা এবং সর্বদা পূর্ণ হওয়ার চেষ্টা। মায়ার কবলে পড়ে আমরা বিষয়ের মধ্যে সেই পূর্ণতা খুঁজি, কিন্তু যেখানে যা নেই সেখানে তা খুঁজে পরিশ্রান্ত, হতাশ ও বিষাদমগ্ন হই। পুরুষানুক্রমে আমরা একই কাজ করে চলেছি তবু

এই হতাশার, এই বিষাদের কারণ খুঁজতে আমাদের ইচ্ছা হয় না। আত্মানন্দজী বলতেন, আমাদের খাবার ইচ্ছা বা খিদে নষ্ট হয়ে গেলে আমরা কত ডাক্তার-বদ্যি করি এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। অথচ মনে আধ্যাত্মিক খিদে নেই, শুধু দেহের খিদেতে মন পড়ে থাকে—তার জন্য উপযুক্ত ডাক্তার-বদ্যি করা দূরে থাক, বিচলিতও হই না। এই বিচলন যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ 'ক্ষুধার্ত ও তৃষিত' হয়ে ধন্য হওয়ার সুযোগ আসে না। ঠাকুর এই সংসারকে বলছেন সারহীন আমড়া, যার আছে কেবল আঁটি আর চামড়া, খেলে হয় অম্লশূল। ঘোর বিষয়ী লোকদের উদ্দেশে বলছেন, ''যাও এখন আমড়ার অম্বল খাওগে, তারপর অসুখ করলে ওষুধ নিতে এসো।'' তাই যত সাধন, তা এই ব্যাকুলতার, 'ক্ষুধার্ত ও তৃষিত' হয়ে ধন্য হওয়ার সাধন। তারপর অরুণোদয় হবে, হৃদয় পূর্ণ হবে।

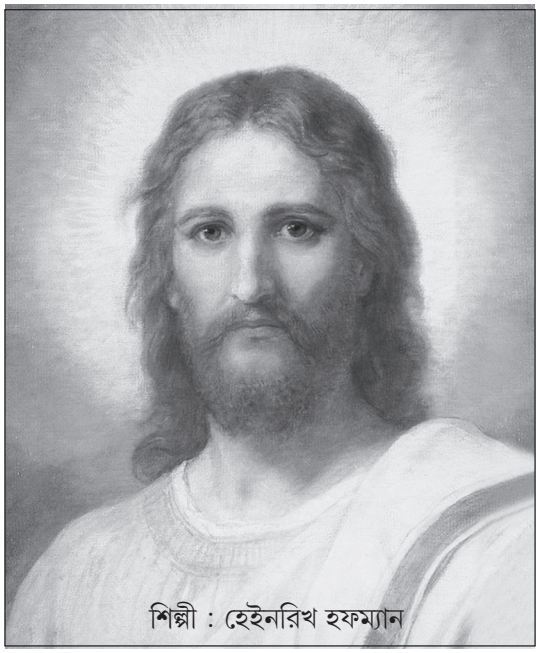

শিল্পী : হেইনরিখ হফম্যান

''অহংকারশূন্য ব্যক্তিরাই ধন্য, কারণ তারাই পৃথিবীর অধীশ্বর হবে।''

আমাদের অস্তিবোধই অহং, আর তার প্রকাশ অহংকার। বেদান্তদর্শনে মনের চারটি ভাগ—মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার। আমাদের অহং বা অস্তিবোধ প্রকাশ পায় মন, বুদ্ধি ও চিত্তকে আশ্রয় করে। আবার মন, বুদ্ধি ও চিত্ত প্রকাশ পায় দেহকে আশ্রয় করে। তাই আমাদের অহং-ও দেহকে আশ্রয় করেই অহংকার হিসাবে প্রকাশিত হয়। তাতে সমস্যা কোথায়? সমস্যা এই, চিরন্তন অস্তি বা সৎ যখন সীমাবদ্ধ একটি শরীরের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাওয়ার চেষ্টা করে তখন তার উৎসের অসীমতা ও দেহের সসীমতার মধ্যে এক জটিলতার সৃষ্টি হয়। তাই আমাদের অহংকারের বাহ্য প্রকাশ সবসময় নিজেকে অপরের চেয়ে বড় বলে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার চেষ্টা করে। আসলে সীমাবদ্ধ দেহের অপূর্ণতার বোধ পূর্ণতা পাওয়ার চেষ্টা করে এই দেহকেই আশ্রয় করে অহংকাররূপে।

সহজভাবে দেখলে আমরা শরীরকেই আমাদের অস্তিত্ব বলে জানি, তাই অহংকার আমাদের দেহের সঙ্গে সম্বন্ধকেই দৃঢ় করে তোলে। দেহ অনিত্য ও সীমাবদ্ধ, তাই তার সঙ্গে সম্বন্ধের দৃঢ়তা যত বাড়ে ততই আমরা আমাদের সত্তার অসীমতার থেকে দূরে চলে যাই। ফলে আমাদের উৎসের সন্ধানে আর মনোযোগ থাকে না। সেই উৎসের অসীমতা বোধে আনতে গেলে এই অহংকার যা সীমাবদ্ধ দেহ-মন-বুদ্ধির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে তাকে ত্যাগ করতে হবে। আমাদের মনে হয় অহংকার চলে গেলে আমাদের কী থাকবে! নরেনকে ঠাকুর যখন ছুঁয়ে দিয়ে অসীমের ঘরে মনকে তুলে দিচ্ছিলেন তখন নরেনের মনে হয়েছিল আমিত্বের নাশেই তো মৃত্যু, তাই চিৎকার করে উঠেছিলেন। নরেনের মতো আধারের যখন এই অবস্থা তখন আমাদের আর কথা কী! ঠাকুর বলছেন দেহবোধ থাকলে এই

আমিবোধ থাকবেই, তাই আমি যখন কিছুতেই যাবে না তখন দাস-আমি নিয়ে থাকো। দাস-আমির অহংকার অহংকারের মধ্যে পড়ে না, কারণ সেই অহংকার ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁর দাস হিসাবে থাকে। এই শরীরী ক্ষুদ্র অহংকার দূর হলে তা অহংকারশূন্যতারই নামান্তর হয়ে পড়ে। ঠাকুর বলেছেন, শ্রীরাধাকে অন্য গোপীরা বলেছিলেন ''তোর অহংকার হয়েছে'', শুনে আর এক সখী বললেন, ''এ অহং কার? কৃষ্ণেরই।'' যিনি নিজের অহং, আমিত্ববোধকে ঈশ্বরে সমর্পণ করেছেন তাঁর নিজের বলে কিছু থাকে না। এটি যেহেতু সাধনসাপেক্ষ, তাই এই অবস্থা যার লাভ হয় সে ধন্য। যিশু বলছেন, সে পৃথিবীর অধীশ্বর হয়। জগতের অধীশ্বর সেই জগদীশ্বর। তাঁর সঙ্গে যে যুক্ত হয়ে থাকে সেও অধীশ্বরতা লাভ করে। অথবা বলা যায়, জগতের কিছুই তাকে বিচলিত করতে পারে না বলে সে জগতের অধীশ্বর।

''তোমরা ধরিত্রীর সার বা লবণস্বরূপ। লবণ যদি লবণত্ব হারিয়ে ফেলে তবে তা আর লবণ নয়। ওই বস্তু তখন অসার।''

ঠাকুর বলছেন, ''মানুষ কি কম গা? সে ঈশ্বর-চিন্তা করতে পারে'' অর্থাৎ সে সসীম হয়েও অসীমের ধারণা করতে পারে। মানুষ জীব বিবর্তনের শেষ কথা। শেষ এইজন্য যে, দৈহিক বিবর্তনের শেষ হয়ে সে মানসিক বিবর্তনের পথে চলেছে। এই দেহটাকে আশ্রয় করে তার অন্তর মনুষ্যত্বের বিকাশসাধন করে চলেছে। তাই স্বামীজী বলছেন, ধর্ম যা মনুষ্যত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তা হল—'Being and Becoming'। ইংরেজিতে তাই মানুষ Human Being—অর্থাৎ মানুষ থেমে নেই, তার অন্তর বিবর্তিত হয়ে চলেছে নিরন্তর। লবণ বিনা খাদ্য যেমন বিস্বাদ লাগে, তেমন মনুষ্যত্বহীন মানুষ আর মানুষ-পদবাচ্য থাকে না। ধরিত্রীর সার যেমন লবণ তেমনই মানুষের সার তার মনুষ্যত্ব। এই 'হয়ে ওঠা'র সাধন মনুষ্যত্বেরই সাধন, যে-সাধনে সিদ্ধ না হলে অধ্যাত্মজীবনে প্রবেশাধিকার নেই। স্বামীজীর উপদেশ তাই মানুষ হওয়ার উপদেশ, মানুষের মতো মানুষ হওয়ার উপদেশ, সাধু বা সন্ন্যাসী হওয়া তো অনেক দূরের কথা।

আমরা মননশীল তাই মানুষ। ঠাকুর তাই বলছেন, ''মানুষ কি কম গা?'' এই মননশীলতা দুরকমের হতে পারে। ভোগাসক্তি থেকে বিষয়ের মনন মানুষকে টেনে নিচে নামিয়ে দেয়, মনুষ্যত্ব হরণ করে। স্থূল ভোগাসক্তি তুচ্ছ করে উচ্চতর বিষয়ের মনন মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটায়। মানুষের কল্পনাশক্তি একটি বিরাট অস্ত্র। এই কল্পনাশক্তি দিয়েই সে উচ্চতর বিষয়ের নিজের মতো করে ধারণা করতে পারে, তারপর এই কল্পনাই ক্রমে উপলব্ধিতে পৌঁছে দেয়। তাই যিশুর এই সাবধানবাণী—তোমরা ধরিত্রীর লবণস্বরূপ—অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে হয়ে ওঠার অসীম সম্ভাবনা, সুতরাং সেই সম্ভাবনাকে কাজে না লাগিয়ে যদি তোমরা উল্টোপথে চলে তা নষ্ট কর, তাহলে তোমাদের মানুষজন্মই বৃথা হবে।

''স্বর্গীয় পিতা যেমন পূর্ণ, তোমরাও সেরূপ পূর্ণতা লাভ করো।''

এই বাণীটি প্রায় সমস্ত ধর্মের মূল কথা। বিভিন্ন মহাপুরুষ ও অবতারগণ এটিই প্রচার করে গেছেন বিভিন্ন প্রতীক, উপমার উল্লেখ করে। ঈশ্বর পূর্ণ তাই ঈশ্বরলাভ মানে পূর্ণতা লাভ করা এবং এই পূর্ণতা লাভই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। পূর্ণতার ধারণা এক-একজনের এক-একরকম। তার কারণ সাধারণভাবে পূর্ণতা অনেক বিষয়ের হতে পারে। দৈহিক, বৌদ্ধিক বা নৈতিক পূর্ণতা ক্রমশ স্থূল থেকে

সূক্ষ্মতর পূর্ণতা। তবে এই পূর্ণতাগুলির ঠাকুরের ভাষায় 'তারে বাড়া, তারে বাড়া' আছে। অর্থাৎ যেটাকে আমি পূর্ণ বলে ধরছি সেটিকেই শেষ বলা চলে না। দৈহিক রূপের, মেধার, আদর্শ জীবনের উচ্চ থেকে উচ্চতর অবস্থা আছে এবং আরও উচ্চ হতে পারে। অতএব যার থেকে আর উচ্চতর কিছু হতে পারে না সেটিই পূর্ণ। সেই পূর্ণতা জগদতীত সত্তা ছাড়া আর কোথাও নেই। তাকে আমরা স্বর্গীয় পিতা বা ঈশ্বর বা আল্লা যাই বলি না কেন, সেই পূর্ণতাকে লক্ষ করেই বলি। যজুর্বেদীয় শান্তিবচনে পূর্ণতার সংজ্ঞা বা ধারণা খুব সুন্দরভাবে বলা হয়েছে—''ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।/ পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥'' ওঁ অক্ষররূপী ব্রহ্ম, ওইটি পূর্ণ—অদঃ পূর্ণম্। আবার এইটি অর্থাৎ এই জগৎও পূর্ণ—পূর্ণম্ ইদম্। ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমাদের উপলব্ধি নেই কিন্তু যেহেতু এই অনুভবের জগতকে আমরা অনন্ত বলে বোধ করি এবং বিজ্ঞানও এর সীমা এখনও পর্যন্ত খুঁজে পায়নি, তাই তার অতীত সত্তাকেও অসীম বলে মেনে নিতে হয়। আর অসীমতা পূর্ণতারই অপর নাম। সেই পূর্ণ সত্তা থেকে এই জগদ্রূপী পূর্ণের উৎপত্তি—পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণ যা তা পূর্ণই, তার সঙ্গে যোগ বা বিয়োগ চলে না। তাই সেই অব্যক্ত সত্তার ব্যক্তরূপ এই জগতকে যদি সরিয়ে রাখি তাহলে সেই পূর্ণ অব্যক্তসত্তা—তাকে যে-নামেই ডাকি না কেন সেটিই অবশিষ্ট থাকে—পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণম্ এব অবশিষ্যতে।

যিশু বলছেন, ''তোমরাও সেই পূর্ণতা লাভ করো'' অর্থাৎ এইটিই জীবনের উদ্দেশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ঈশ্বরলাভই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। কীভাবে তা লাভ করতে হবে তার উপায়ও এই শান্তিবচনে সূত্রাকারে বলা আছে। এই জগৎ পূর্ণ কেন? কারণ এটি পূর্ণব্রহ্মের ব্যক্তরূপ। সমস্ত মহাপুরুষদের অনুভব তা-ই বলে। ঠাকুর বলছেন সিঁড়ির এক-একটি ধাপ পেরিয়ে ছাদে উঠে মানুষ দেখে যে, যা দিয়ে ছাদ তৈরি তা দিয়েই সিঁড়িও তৈরি। যিনি ব্রহ্মানন্দ আস্বাদনের সাধন করছেন তিনি এই ব্যক্ত জগতের বৈচিত্র্যকে ত্যাগ করে চলেন, যার নাম নেতি নেতি বিচার। কারণ তিনি জানেন যে ব্রহ্মের এই ব্যক্তরূপ অব্যক্ত ব্রহ্মকে ঢেকে রেখেছে, তাই সেটি সরালে সেই অব্যক্ত ব্রহ্মই থাকবে। আর যিনি অব্যক্তের উপাসনা করতে অক্ষম তিনি ব্রহ্মের ব্যক্তরূপ এই জগতেই তার সন্ধান করবেন। তিনি জানেন অব্যক্তকে সরিয়ে রেখে এই ব্যক্ত জগতেও তাঁরই প্রকাশ ধরা পড়বে। ব্যক্ত বা অব্যক্ত সত্তা, যাকেই বাদ দিই সেই পূর্ণতাই থেকে যাবে। আমরা যারা নেতি বিচার করে ব্রহ্মানন্দ লাভের উপযুক্ত নই, তাদের জন্য স্বামীজী তাই যুগোপযোগী উপাসনা দেখিয়ে দিয়ে গেছেন—''ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়/ মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে এ সবার পায়।'' সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম সর্বভূতে প্রেমস্বরূপ হয়ে অবস্থান করছেন, তাঁকে সেবা ও পূজার দ্বারা সেখানে আবিষ্কার করো, সেই পূর্ণতাকেই লাভ করবে। ঠাকুর তাঁর সামনে বসে-থাকা ভক্তদের মধ্য দিয়ে তাঁর সর্বব্যাপী ভবতারিণী মাকেই উঁকি দিতে দেখছেন।

বাইবেলের একটি গল্প শুনে আমরা এই আলোচনা শেষ করব।

গ্যালিলি অঞ্চলে এক ধনী মানুষ বাস করতেন। তাঁর এক ছেলে। সে খুব সুন্দর ও সুগঠিত। পিতা তার নাম রেখেছিলেন ওফেরাস। ক্রমশ ওফেরাস অতি সুপুরুষ ও বলবান হয়ে উঠল। পিতা একদিন যুবক পুত্রকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''তুমি কী করতে চাও?'' যুবক নিজের শরীর ও শক্তি সম্বন্ধে খুব সচেতন, তাই উত্তরে বলল, ''আমায় যদি কারও অধীনে কাজ করতে হয় তাহলে সর্বাপেক্ষা বলবান

কোনও রাজা বা সম্রাটের অধীনে কাজ করব।" পিতা বললেন, ''ঠিক আছে, খুঁজে দেখো সেরকম শক্তিমান রাজা কোথায় পাও।" ওফেরাস বেরিয়ে পড়ল। বহু জায়গা ঘুরেও সবার চেয়ে শক্তিশালী কাউকে পাওয়া গেল না। শেষে এক সম্পদশালী রাজ্যে পৌঁছে রাজার সঙ্গে দেখা করল। রাজা তার বলবান শরীর দেখে খুশি হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ''তুমি আমার একান্ত দেহরক্ষী হয়ে থাকার কাজটি করবে?" ওফেরাস বলল, ''আমি সর্বাপেক্ষা বলবান ব্যক্তির অধীনে কাজ করতে চাই, আপনি কি তাই?" রাজা বললেন, ''আমি সর্বাপেক্ষা শক্তিমান তো বটেই। আমার আশেপাশের রাজ্যের রাজারা আমার অধীন, তারা আমায় কর দেয়।" ওফেরাস রাজি হয়ে কাজে লেগে গেল।

একদিন এক সন্ন্যাসী এসে রাজাকে ধনসম্পদের যথার্থ ব্যবহার, বিলাসব্যসন ত্যাগের কথা বলছিলেন। তা না হলে দুষ্টশক্তির অধীনে পড়ে সমস্ত নষ্ট হয়ে যাবে। ওফেরাস দেখল সন্ন্যাসী যতবার দুষ্টশক্তির কথা বলেন ততবারই রাজা তাঁর বুকে হাত দিয়ে একটা চিহ্ন আঁকেন। সন্ন্যাসী চলে গেলে সে রাজাকে জিজ্ঞাসা করল, ''আপনি সন্ন্যাসীর মুখে দুষ্টশক্তির কথা শুনলেই বুকে হাত দিয়ে কী একটা আঁকছিলেন কেন?" রাজা বললেন, ''তুমি জান না, সে ভয়ংকর ব্যক্তি, তার পাল্লায় পড়লে সর্বনাশ ঘটে যাবে।" তা শুনে ওফেরাস বলল, ''তাহলে তো আপনি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী নন, আমি আর আপনার কাজ করব না, সেই অতি শক্তিশালী ব্যক্তির সঙ্গেই কাজ করব।" রাজা দুঃখিত হয়ে বললেন, ''ঠিক আছে, দেখো তাকে কোথায় পাও।" ওফেরাস আবার বেরিয়ে পড়ল।

ঘুরতে ঘুরতে এক জঙ্গলের পায়ে চলা পথ ধরে দিশাহীন যাত্রা। হঠাৎ সে দেখল এক গাছের পেছন থেকে কালো ঘোড়ায় চড়া এক ভয়ংকর মূর্তি বেরিয়ে এসে তার পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। সর্বাঙ্গ কালো পোশাকে ঢাকা মূর্তিটি বিচিত্র গলায় বলে উঠল, ''তুমি কে?" ওফেরাস বলল, ''আমি দুষ্টশক্তির খোঁজে বেরিয়েছি, কারণ শুনেছি সে সর্বশক্তিমান, আর আমার ইচ্ছা যে সেই সর্বশক্তিমানের অধীনে কাজ করি।" মূর্তিটি বলল, ''আমিই সেই দুষ্টশক্তি। আমার নাম শয়তান। সবাই আমাকে ভয় করে চলে। তবে তুমি সরল ছেলে, চলো আমার সঙ্গে।" তারপর সে কোথা থেকে আর একটি কালো ঘোড়া ও কালো পোশাক এনে ওফেরাসকে দিয়ে তাকে অনুসরণ করতে বলল।

একদিন ওফেরাস তার পেছনে যেতে যেতে দেখে, পথে দুটি গাছ একটির ওপর একটি আড়াআড়িভাবে পড়ে আছে। সেই দেখেই শয়তান বলল, ''চলো ঘুরপথে যাই, এটা ডিঙিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না।" ওফেরাস এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, ''ওই ক্রস চিহ্নটি যিশু বলে একজনের, তাকে আমি এড়িয়ে চলি।" ওফেরাস বলল, ''তার মানে তাকে তুমি ভয় পাও, তাহলে তোমার চেয়েও শক্তিমান পুরুষ আছে। তাহলে শর্ত অনুযায়ী তোমার সঙ্গে আর আমি যাব না, আমি যিশুকে খুঁজে বার করব।" শয়তান বিকৃত মুখে বলল, ''যাও, দেখো তাকে কোথায় খুঁজে পাও।"

আবার ওফেরাসের খোঁজার পালা শুরু। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সে সবাইকে জিজ্ঞাসা করে যদি কেউ সন্ধান দিতে পারে। শেষে একজন বলল, ''যিশু কোথায় থাকেন জানি না, তবে তাঁকে কাতর প্রার্থনা জানালে তিনি তার কাছে আসেন।" ওফেরাস ভাবল সে তো প্রার্থনা কী করে করতে হয় জানে না, কী করবে সে! মনটা খুব দমে গেল। এমন সময় এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা। তিনি সব শুনে ওফেরাসকে বললেন, ''দেখো তাঁর কাছে প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রিয় কাজ করতে হয়। প্রার্থনা কীভাবে করতে হয় তা তোমায় আমি শিখিয়ে দিচ্ছি, আর তোমার তো খুব বলবান

চেহারা! এক কাজ করো—একটু এগোলে এক নদী, সেটা পেরনো খুব মুশকিল হয় যাত্রীদের। তুমি তাঁর কাজ করো। পারের যাত্রীদের কাঁধে করে পার করে দিয়ো, আর বিনিময়ে তারা যা দেবে তাতে তোমার দিন গুজরান হয়ে যাবে। এই আমার লাঠিটা নাও, পার করার সময় এটা তোমার খুব কাজে দেবে।" কথাগুলি ওফেরাসের মনে ধরল, সে রাজি হয়ে গেল। সন্ন্যাসী চলে যাওয়ার সময় বলে গেলেন যে আবার তিনি আসবেন।

ওফেরাস নদীর ধারে কুটির বেঁধে তার কাজ শুরু করে দিল। কত রকমের মানুষ আসে আর তাদের পার করে দিতে হয়। তাদের খুশিমুখ দেখে তারও আনন্দ হয়। তাদের কাছ থেকে সে যা পায় তাতে তার পেট চলে যায়, আর রাতে আকাশের দিকে তাকিয়ে সন্ন্যাসীর শেখানো প্রার্থনা করে। বহুদিন কেটে গেল এইভাবে। একদিন রাতে বাইরে আকাশের দিকে মুখ করে প্রার্থনার সময় তার চোখ ভরে জল এল। সে জলভরা চোখে উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠল, ''হে যিশু, কতদিন হয়ে গেল আমি তো তোমার কাজে ফাঁকি দিইনি, প্রার্থনাও করি, কিন্তু তুমি তো এখনও এলে না!"

সেখানেই সে শুয়ে পড়ল। তন্দ্রার ঘোরে শুনল কে যেন ডাকছে। ধড়মড় করে উঠে বসে দেখে একটি সুন্দর ছোট্ট ছেলে কচিগলায় বলছে, ''আমাকে পার করে দেবে?" তাকে দেখেই ওফেরাসের মনে এমন বাৎসল্যের সঞ্চার হল যে, সে হাত বাড়িয়ে বলল, ''এসো বাবা এসো, কত মানুষকে পার করে দিলাম আর মিষ্টি ছেলে তোমায় পার করে দেব না?" ওফেরাস আদর করে তাকে কাঁধে তুলে নিল। সুন্দর কচি পা দুটি তার বুকের ওপর দুলতে লাগল, ওফেরাস জলে নামল। কিন্তু আজ এ কী! জল বড় গভীর! তার কোমরের বেশি হয় না কখনও, কিন্তু আজ জল তার কোমর ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আর ছোট ছেলেটির ওজন যেন ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। শক্তিমান, বিশালদেহী ওফেরাস হাঁপাতে লাগল। কোনরকমে পারের কাছে এসে বলল, ''তুমি কে বাবা? কত ভারি ভারি মানুষ পার করেছি কিন্তু তোমার মতো বাচ্চা ছেলের ওজন তো তাদেরও ছাড়িয়ে গেল!" ছেলেটি তখন বলল, ''কী করব বলো, সমগ্র জগতের দুঃখের ভার আমার ওপর, তাই তো যারা আমায় অন্তরের সঙ্গে চায় তাদের আমি কিছু কিছু ভার দিই। তুমি এক কাজ করো, ওপারে ফিরে গিয়ে তোমার লাঠিটা মাটিতে পুঁতে তার সামনে আজ সারারাত প্রার্থনায় কাটাও। দেখবে সকালে ওই শুকনো লাঠিটায় নতুন পল্লবের কুঁড়ি বেরিয়েছে। তখন বুঝবে যে আমি তোমার সঙ্গেই আছি ও থাকব।"

ওফেরাস নদী পেরিয়ে ফিরে আসতে লাগল। তার মন আজ এক অচেনা আনন্দে ভরপুর। সে এপারে এসে লাঠিটা কুটিরের সামনে পুঁতে দিল আর তার সামনে বসে আকুল প্রার্থনায় ডুবে গেল। রাত কখন পেরিয়ে গেছে সে জানে না। সকালে ভোরের আলোয় দেখল অবাক কাণ্ড! সেই শুকনো পুরনো কাঠের লাঠিতে সত্যি দুটো কচি পল্লবের উদ্গম হয়েছে! সে আনন্দে অধীর হয়ে ছোট ছেলেটির মহিমা চিন্তা করতে লাগল। ঘটনাচক্রে সেদিনই সেই সন্ন্যাসী এসে হাজির। তিনি সমস্ত শুনে আর শুকনো লাঠিতে কচিপাতা দেখে চোখের জল সামলাতে পারলেন না। কেবল বললেন, ''দেখো আমি কতদিন তাঁর সন্ধানে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি কিন্তু তাঁকে পাইনি, আর তুমি নিষ্পাপ সরলতায় তাঁকে লাভ করেছ। তোমার নাম দিলাম খ্রিস্টোফেরাস। তুমি পৃথিবীময় যিশুর মহিমা খ্যাপন করে বেড়াও, স্বয়ং প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।"

নতুন নামে খ্রিস্টোফেরাস আবার বেরিয়ে পড়ল। তবে এবার অন্য কাজে। যিশুর মহিমা গেয়ে মানুষের দুঃখমোচনের চেষ্টায় জীবনপাত করে যিশুরই সান্নিধ্যে চলে গেল সে।